বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

স্বর্ণময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়

চতুর্থ সেমিস্টারের অন্তর্গত এস ই সি -টু কোর্সের জন্য উপস্থাপিত

প্রকল্প পত্র :-অন্নদামঙ্গল কাব্যের আধুনিক জীবন ভাবনা

শিক্ষার্থীর নাম :-রাখী কর

সেমিস্টার :-চতুর্থ

পত্র :-এস ই সি টু

রেজিস্ট্রেশন নং -VU211040230,2021-2022

রোল নং :-১১১৪১৫২-২১০০১৫

শিক্ষাবর্ষ :২০২২-২০২৩

Phone: 9932873484/7501133806

SWARNAMOYEE JOGENDRANATH MAHAVIDYALAYA

Govt. Aided General Degree College | Estd.: 2014

At+P.O.: Amdabad, P.S.: Nandigram, Dist.: PurbaMedinipur, PIN 721650

www.sjmahavidyalaya.in| Email: sjmahavidyalaya@gmail.com

CERTIFICATE

This is to certify that Rakhi Kar Roll: 1114152 No: 210015, Reg.No:- VU211040280 of 2021-2022, a student of B.A. 4th Semester (Honours), Bengali Department, Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya for the session 2022-2023; submitted his/her project report for partial fulfillment of the syllabus of SEC-2,(CBCS) prescribed by Vidyasagar University. The project has been prepared under the supervision of Dr. Madhumita Basu and Surajit Mandal and ready to place before examiner for evaluation.

Supervisors

Dr. Ratan Kumar Samanta
Principal
S.J Mahavidyalaya

Principal
Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya
Amdabad :: Purba Medinipur :: Pin-721650

Dr. Madhumita Basu
Assistant Professor & HOD
Department of Begali.
S.J Mahavidyalaya

Head of the Department,
Department of Bengali
Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya
Amdabad, P.S.: Nandigram, ... Pin-721650

Surajit Mandal
SACT-I, Department of
Bengali
S.J Mahavidyalaya
Mahavidyalaya

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
1	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	2
2	প্রকল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন	3
3	বিষয় পর্যালোচনা [illegible] আধুনিক জীবনদর্শন	4-17
4	উপসংহার	18
5	সিদ্ধান্ত	19
6	গ্রন্থপঞ্জি	20

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

প্রথম অধ্যায়

(ক) প্রকল্প কাকে বলে ?

⇒ কোনো একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার বা মূল্যায়ন এর মাধ্যমে যে কার্য সম্পাদন করা হয় তাকে প্রকল্প বলা হয়।

(খ) বৈশিষ্ট্য :-

(১) সমস্যা কেন্দ্রিক :- প্রকল্প হয় সমস্যাকেন্দ্রিক অর্থাৎ কোনো না কোন সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রকল্প নির্ধারিত হয়ে থাকে।

(২) উদ্দেশ্য ভিত্তিক :- কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে প্রকল্পের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে।

(৩) আত্মনিবদ্ধ :- প্রকল্পমূলক কাজে সম্পাদনা করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের কাজের মাধ্যমে আত্মনিবদ্ধ দেখা যায়।

(৪) সৃজনশীলতা :- প্রকল্পমূলক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়।

(৫) অনুসন্ধান মূলক কাজ :- প্রকল্প রূপায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা নানা রকমের অনুসন্ধান মূলক কাজের মধ্যে দিয়ে শেখে।

(৬) বাস্তবতা কেন্দ্রিক :- প্রকল্প ভিত্তিক কাজ সর্বদা কোনো না কোনো বাস্তব সমস্যা কে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে।

(৭) সামাজিক গুনাবলির বিকাশ :- প্রকল্প মূলক কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহবেদনা, একে অপরের উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি সামাজিক গুনাবলি গুলি বিকশিত হওয়ার সুযোগ গড়ে ওঠে।

(৩) প্রকল্প কত প্রকার হয় এবং কী কী?

⇒ সাধারণত দুই প্রকার হয় যথা - (i) একক প্রকল্প,
(ii) দলগত প্রকল্প,

(৪) প্রকল্প কাজের উদ্দেশ্য গুলি কী কী?

⇒ প্রকল্প কাজের উদ্দেশ্য গুলি হল -

(১) প্রতিটি শিক্ষার্থীকে উৎপাদন মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করা, শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা এবং তাদের দলবদ্ধ করা, মানসিক বিকাশ সাধন করা,

(২) ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সহযোগিতা বোধ জাগিয়ে তোলা,

(৩) ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে কলমে কাজ করতে শেখানো,

(৪) ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীল কাজের প্রক্রিয়াতে সহায়তা করা,

(৫) প্রকল্পমূলক কাজের উপকারিতা কী?

⇒ (১) প্রকল্প রূপায়ণের মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়,

(২) শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগত ভাবে কাজ করার মানসিকতা বৃদ্ধি হবে

(৩) প্রকল্প রূপায়ণ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা পড়ার বাইরে গিয়ে বিভিন্ন জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাওয়া যায়,

(৬) প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কী?

⇒ বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রগতির জন্য প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম, প্রতিটি দেশের এখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সামাজিক অর্থনীতির দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে, তারই অংশ হিসাবে উন্নয়ন পরিকল্পনার সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকে, এবং সেই প্রকল্প সমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পদ বিনিয়োগ করা হয় যাতে জাতীয় উন্নয়ন অব্যাহত থাকে,

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রকল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন

আমরা জানি বাংলা সাহিত্যে তিনটি যুগ যথা- (i) প্রাচীন যুগ (ii) মধ্যযুগ (iii) আধুনিক যুগ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিক প্রভাব দ্বারা অনেকাংশেই প্রভাবিত হয়েছে. যেমন: অন্নদামঙ্গলে আমি অনেক আধুনিক প্রভাব লক্ষ করেছি, অন্নদামঙ্গল কাব্যের - ঈশ্বরী পাটনি চরিত্র, ব্যাস কাহিনী, হরিহোড়ের বর্ণনা এবং শিবের চরিত্রের মানবায়ন প্রভৃতি, অন্নদামঙ্গল কাব্যের মধ্যদিয়ে যা ভারত চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যদিয়ে আধুনিক যুগের কাহিনী বর্ণিত করেছে, মধ্যযুগের সাহিত্যিক হয়েও আধুনিকতার আলোকে তাকে প্রভাবিত করেছে। উক্ত বিষয়গুলির উপর গভীরভাবে আলোকপাত করার জন্য আমি গভীরভাবে শুধু অন্নদামঙ্গল কাব্যের আধুনিকতার বিষয়টি নির্বাচন করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়

- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছর বা তার চেয়েও বেশি সময়ের ইতিহাস। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যুগ কে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। যদিও সাহিত্যের ইতিহাসে সবসময় সাল তারিখের হিসেব মেপে যুগ বিভাগ করা যায় না, সাল তারিখ দেখে যুগ শুরু হয় না, তার ক্ষেত্র ও আছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

① প্রাচীন যুগ বা আদিযুগ (৭৫০ - ১২০০)
② মধ্যযুগ (১২০১ - ১৮০০)
③ আধুনিক যুগ। (১৮০০ - বর্তমান সময়)

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

- আদিযুগ (১০০০ - ১২০০ খ্রিঃ)
- মধ্যযুগ (১২০০ - ১৮০০ খ্রিঃ)
  - প্রাক চৈতন্যযুগ (১৩৫০ - ১৫০০ খ্রিঃ)
    - বৈষ্ণব সাহিত্য
    - মঙ্গল কাব্য
    - অনুবাদ সাহিত্য
  - চৈতন্যযুগ (১৫০০ - ১৬০০ খ্রিঃ)
    - বৈষ্ণবপদাবলী
    - চৈতন্য জীবনী
    - অনুবাদ সাহিত্য
    - মঙ্গল কাব্য
  - চৈতন্য পরবর্তী যুগ (১৬০০ - ১৮০০ খ্রিঃ)
- আধুনিক যুগ (১৮০০ খ্রিঃ - বর্তমান সময়)
  - অন্নদামঙ্গল
  - শাক্তপদাবলী
  - বাউলগান
  - [illegible]

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বিশেষ এক শ্রেণির ধর্ম বিষয়ক আখ্যান কাব্য নামে পরিচিত। যে কাব্যে দেবতার আরাধনা, মাহাত্ম্য - কীর্তন করা হয়, যে কাব্য শ্রবণেও মঙ্গল হয় এবং বিপরীতে হয় অমঙ্গল, যে কাব্য ঘরে রাখলেও মঙ্গল হয় তাকে বলা হয় মঙ্গল কাব্য।

⊞ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ধারায় বিজয় গুপ্তের মঙ্গল কাব্য :—

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি পদ্মাপুরাণ নামক মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করে মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তাঁর কাব্যের ভণিতা থেকে কাব্য রচনার কাল পাওয়া যায় ১৪৮৪ খ্রিঃ। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, বিজয় গুপ্ত পনেরো শতকের মধ্যভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বরিশালের ঘাঘর ও ঘন্টেশ্বরী নদীর মধ্যবর্তী ফুল্লশ্রী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পত্নীর নাম রুক্মিণী।

মনসামঙ্গলের প্রাথমিক কবিদের মধ্যে কানা হরিদত্ত প্রথম এবং বিজয় গুপ্ত দ্বিতীয়। হরিদত্তের কাব্য ভাবে - ভাষায় দুর্বল। তাই বিজয় গুপ্ত মনসাদেবীর স্বপ্নাদেশ লাভ করে কাব্য রচনায় ব্রতী হন, দেবীর মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার এ কাব্যের প্রধান লক্ষ্য, কবির ভাষায় এ কাব্য পাঠ করলে দারিদ্র্যের বিনাশ ও সন্তান হীনের সন্তান লাভ হয় এবং রোগ মুক্তি ও বন্দির বন্দীন মুক্তি ঘটে।

মনসা ও চাঁদ সদাগর কাব্যের দুটি প্রধান চরিত্র, মনসা অত্যাচারী সামন্তদের প্রতিনিধি, আর চাঁদ অত্যাচারী শাসকের পূজা প্রতিবাদী বিদ্রোহী চরিত্র। মনসা নানা কৌশল অবলম্বন ও ক্ষমতার চাপ প্রয়োগ করে শিব ভক্ত চাঁদ সদাগরের পূজা আদায় করেন।

সর্পদেবী মনসার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারের মাধ্যমে বিজয় গুপ্ত হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার ইসলাম ধর্মের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে

প্রাতঃবেলা এসে গেলেন, বিশেষতঃ পালায় বিষ্ণু থাকে নন্দীমার্দিন বলে, পূজামণ্ডপে মনসা চাঁদ-বেহুলা লখীন্দরের কাহিনী গীত ও পঠিত হতো।

■ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুকুন্দ রামচক্রবর্তীর মঙ্গল কাব্য:-

দেবী চণ্ডীকে নিয়ে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কাহিনী গড়ে উঠেছে, এ কাব্য দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচারের সাথে প্রাচীন কালকেতু ফুল্লরার জীবনের উত্থান ও সুখ-দুঃখের কাহিনী যুক্ত হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী শুরু হয়েছে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী দুই খণ্ডে বিভক্ত, একটি আখেটিক খণ্ড অর্থাৎ ব্যাধ কালকেতুর গল্প, আরেকটি বণিক খণ্ড, অর্থাৎ ধনপতির গল্প। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিগণ হলেন মানিকদত্ত, দ্বিজ মাধব, মুরারীশীল কোতদার ইত্যাদি। ভাঁড়-দত্ত এ কাব্যের সবচেয়ে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত চরিত্র। এ রকম চরিত্র মঙ্গলকাব্যে খুব কম আছে।

কাহিনী নির্মাণ, চরিত্র চিত্রণ ও ভাষা ব্যবহারে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ কাব্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো কালকেতু, ফুল্লরা, পুষ্পকেতু, অন্যান্যরা, ভাঁড়-দত্ত, মুরারীশীল কোতদার ইত্যাদি।

■ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বীরায় ভারতচন্দ্রের মঙ্গল কাব্য:-

'নূতন মঙ্গল' বা 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্যাকাশে, সবচেয়ে উজ্জ্বলতর নক্ষত্র কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের এই কাব্য। হুগলী জেলার অন্তর্গত ভুরশুট গ্রামে ১৭১৩ খ্রিঃ সম্ভবত কবির পিতা নরেন্দ্র রায় এবং পূর্বপুরুষ জমিদার সূত্রে 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত। কিন্তু অল্প বয়সে মামা বাড়িতে পালিত হন, কবি চোদ্দ বছর বয়সে কেশরকোনী বংশের কন্যাকে বিবাহ করার জন্য ত্যাজ্য পুত্র হন।

প্রাপ্ত পুঁথিগুলির লিপিকাল ১৭৭৬-১৮২৩ খ্রিঃ মধ্যবর্তী সময়। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে এই কাব্যটি মুদ্রিত হয়। পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগর কৃত সংস্করণটি আদর্শ ধরে অন্নদামঙ্গল কাব্যের অন্যান্য সংস্করণগুলি প্রকাশিত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এই কাব্যের কয়েকটি পুঁথি সংরক্ষিত আছে।

ভারতচন্দ্র স্বয়ং অন্নদামঙ্গল কাব্যকে "নূতনমঙ্গল" আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন। কবি এই কাব্যে প্রথা মঙ্গলকাব্যের ধারায় পূর্ব ঐতিহ্য ও আঙ্গিককে অনুসরণ করলেও, বিষয়বস্তুর অবতারণায় কিছু নতুনত্বের নিদর্শন রেখেছেন। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ন্যায় অন্নদামঙ্গল গ্রামীণ সংস্কৃতি বা পরিবেশে রচিত হয়নি; এই কাব্য একান্তই রাজসভার কাব্য।

"ভারতচন্দ্র এই কাব্যের আখ্যানবস্তু সংগ্রহ করেছিলেন "কাশীখণ্ড উপপুরাণ", "মার্কণ্ডেয় পুরাণ", "ভাগবত পুরাণ", "ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্" ইত্যাদি, গ্রন্থ ও লোক প্রচলিত জনশ্রুতি থেকে। অন্নদামঙ্গল কাব্যের বৈশিষ্ট্য হল ছন্দ ও অলংকারের সুদক্ষ প্রয়োগ। সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ভারতচন্দ্র প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের বিভিন্ন ছন্দ ও অলংকার সার্থক ভাবে প্রয়োগ করেন এই কাব্যে। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করেন,

"রাজসভাকবি রায়গুণাকরের
অন্নদামঙ্গল - গান রাজকণ্ঠের
মণিমালার মতো, যেমন তাহার
উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার
কারুকার্য।"

কবি প্রথমে সংস্কৃত, পরে ফারসি ভাষা শেখেন। রামচন্দ্র মুন্সীর কাছে ফারসি ভাষা শিক্ষা লাভ করেন, এবং পরবর্তী কালে অন্নদামঙ্গল রচনা করেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রায়ের সভাকবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর এই কাব্য রচনা করেন। যুগ সন্ধিক্ষণের কবি তিনি মধ্যযুগের শেষ এবং আধুনিক যুগের শুরুর সময়কার কবি, অন্নদামঙ্গলকে তিনটি খণ্ডে বিভক্ত করা যায় →

(ক) অন্নদামঙ্গল বা নূতন মঙ্গল।

(খ) কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর।

(গ) অন্নপূর্ণামঙ্গল বা মানসিংহ।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের বিষয়বস্তু :–

অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের রচিত একটি মঙ্গলকাব্য, বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগের অবসানে মঙ্গলকাব্যের সূচনা হয়, কবি বুঝেছিলেন সেযুগে বাংলা সাহিত্যে পরাধীন, তাই তিনি মঙ্গল কাব্যের আদিকবিদের অনুসরণে কাব্য রচনা শুরু করলেও কাব্যের রচনাশৈলী অনস্বীকার্য তাতে আঙ্গিক, কাব্যটি দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য বর্ণনা হয়েছে। ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে ভারতচন্দ্র এই কাব্য রচনা করেছিলেন, ভারতচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাংলায় দেবী পূজার প্রচলন করেন। তিনি ভারতচন্দ্রকে রায়গুণাকর উপাধি প্রদান করেন দেবীর মাহাত্ম্য ব্যঞ্জক একটি কাব্য রচনায় অনুরোধ করেন। সমগ্র কাব্য টি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত :- (ক) অন্নদামঙ্গল বা নূতন মঙ্গল, (খ) বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গল, (গ) অন্নপূর্ণামঙ্গল বা মানসিংহ।

মঙ্গলকাব্য ধারায় অন্নদামঙ্গল কাব্যকে একটি পৃথক শাখা রূপে গণ্য করা হয় না; কারণ ভারতচন্দ্র ছাড়া অন্য কোনো কবি এই বিষয়বস্তু অবলম্বন করে কাব্যরচনা করেননি, সমগ্র অন্নদা মঙ্গল কাব্যের কোনো নির্ভর যোগ্য প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় নি।

এর ফলে যেমন জমি থেকে সরকারের রাজস্ব আদায় হত না, তেমনি জায়গীদারের স্থানীয় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়তে থাকত, তিনি সরকারী কর্মচারীদের অধীন জমি সরকারের হাতে নিয়ে এলেন এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ বাৎসরিক রাজস্ব দেবার বিনিময়ে ঐ জমি ইজারা দিলেন, এই সব ইজারাদারই পরবর্তীকালে জমিদার হিসাবে পরিচিত হন। মুর্শিদকুলি খাঁ রাজস্ব আদায়ের ব্যয় হ্রাস, অপ্রয়োজনীয় সৈন্য সংখ্যা হ্রাস এবং শাসনকার্যে মিতব্যয়িতা অনুসরণ করে সরকারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছিলেন।

মুর্শিদকুলির কোনো পুত্র সন্তান না থাকায় তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন খাঁ বাংলার পরবর্তী নবাব হন, সুজাউদ্দিন মুর্শিদকুলির সহায়কার বাংলার দেওয়ান সরফরাজকে দেওয়ান পদে বহাল রাখেন। শাসনের প্রথমদিকে সুজাউদ্দিন খাঁ ছিলেন উদারচেতা, ন্যায়পরায়ন নবাব, কিন্তু মুঘল আমীর ওমরাহের মতো তিনি শেষ জীবনে বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েন,

১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র ঢাকার শাসনকর্তা সরফরাজ পিতার সিংহাসনে বসেন, তিনি ছিলেন যেমন অকর্মণ্য তেমনি ক্ষমতাহীন, ফলে বাংলাদেশের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়, এই সুযোগে আলিবর্দী খাঁ ক্ষমতাশীল হয়ে ওঠেন। আলীবর্দী মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহকে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ উপঢৌকন দিয়ে অন্যায় ভাবে লব্ধ বাংলার শাসন পদের অধিকার কায়েম করেন, আলীবর্দী বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১৭৪২ থেকে ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দের পর্যন্ত মারাঠা বর্গীদের বারবার আক্রমণে আলীবর্দী পর্যুদস্ত হয়ে পড়েন। মারাঠা সেনাবাহিনী ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে পশ্চিম বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অত্যাচার চালিয়ে, লুটতরাজ করে নারী দেহ উপর ঘৃণ্য অত্যাচার শুরু করে আতঙ্ক ছড়ায়, দেশ রক্ষার চেষ্টা করলে ও আলিবর্দী যখন মারাঠাদের রোধ করতে পারলে না, তখন বারো লক্ষ টাকা চৌথ এবং উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের অধিকার তাদেরকে দিতে রাজি হন মারাঠা আক্রমণ থেকে বাংলাদেশকে বাঁচাতে।

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা ভারতচন্দ্রের কাব্যে :-

ভারতচন্দ্র ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রধান কবি, তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি প্রতিনিধি, পলাশির পূর্বে পঞ্চাশ বৎসরের তিনি মুখপাত্র, পলাশীর পরে পঞ্চাশ বৎসরের তিনি - সমাদৃত এবং সাহিত্যিক, রবীন্দ্রনাথের যুগেও তিনি প্রমথ চৌধুরীর মতো আধুনিক সমালোচকদের অকুণ্ঠিত প্রশংসালাভে, শিক্ষিত বাঙালি জাতির কাছে প্রয়োজনীয় প্রতিযোগিক তিনি, একথা পরিষ্কার যে ভারতচন্দ্রের কাব্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপট বাস্তবসম্মত রূপে চিত্রিত,

আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতচন্দ্রের জন্ম এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য অন্নদামঙ্গল রচিত হয় ১৭৫২ - ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে. আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করব.

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস দেখলে বোঝা যাবে - ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু এবং ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজদের রাজত্ব শুরু হয়. সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকেই মোগল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় শুরু হয়েছিল, দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের রাজকোষ শূন্য. সে সময়ে ঔরঙ্গজেবের প্রধান ভরসা মুর্শিদকুলি নিজে বন্দোবস্ত ও বাংলার রাজস্ব, ফলে মুর্শিদকুলি তাঁর দক্ষতা দেখালেন বাংলার রাজস্ব আদায়ে. ঔরঙ্গজেবের পরে মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার রাজত্ব লাভ করেন, এবং মুর্শিদকুলি খাঁ জন্মেছিলেন ভারতেই ব্রাহ্মণ কুলে, কিন্তু পালিত হন পারসিক প্রভুর আশ্রয়ে মুসলমান রূপে, পারস্যে. মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভেই নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, মোগল রাজ্যের শূন্য কোষাগারে মুর্শিদকুলি বাংলায় রাজস্ব নিয়মিত যুগিয়েছেন. বস্তুত শাসন দক্ষতায় এবং সর্বোপরি স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, রাজকর্মচারিগণ বেতনের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি জায়গীর হিসেবে ভোগদখল করতেন.

অন্যদিকে ইংরেজদের শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকে এবং আলিবর্দী নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েন। একদিকে যখন মারাঠা এবং অন্যদিকে তাদের সঙ্গে ইংরেজ বণিক সম্পর্কে আলিবর্দী সচেতন ছিলেন। এই কারণে আলিবর্দী ইংরেজদের সাথে মৈত্রী নীতি অনুসরণ করেছিলেন। তবুও ইংরেজ বণিকেরা সুকৌশলে বাংলার বাণিজ্য চালাতে ও অধিকার ফলাতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন।

আলিবর্দীর মৃত্যু হয় ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে, মৃত্যুর পূর্বেই ছোট মেয়ের পুত্র সিরাজকে নবাব মনোনীত করে যান।

★ অষ্টাদশ শতাব্দীর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বৈশিষ্ট্য :—

① জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব এবং রাজস্ব আদায়ে জমিদারের অত্যাচার,

② নবাবী আমলের বিলাস, ব্যসন, ব্যভিচার ও বিশৃঙ্খল দেশের সামাজিক কাঠামো ভেঙে খান খান হয়ে যাওয়া,

③ বিদেশী ইংরেজ বণিকের বাণিজ্যের নামে শোষণ ও ক্ষমতা দখলের লড়াই।

④ পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ তখন অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করলো নতুন বণিক রাজ্যের কাছে।

⑤ গ্রামীন গোষ্ঠীজীবনের ভাঙন দশা অন্যদিকে শহরে দরবারী সংস্কৃতি তথা ব্যক্তিস্বার্থের প্রাধান্য, সেই সঙ্গে নাগরজীবনের আড়ম্বরপ্রিয়, বিলাস-ব্যসন, আভিজাত তথা কৃত্রিমতা - ভারতচন্দ্রের কাব্যে যার নিদর্শন রয়েছে।

⑥ অত্যাচার ও উৎপীড়নে মানুষ যেমন দেবতার প্রতি আস্থা রাখতে পারলো না, আবার কেউ কেউ দেবতার প্রতি একান্ত বিশ্বাস আস্থা রাখতে পারে। অন্নদামঙ্গল ও শাক্ত পদাবলী তার সাক্ষ্য বহন করে।

⑦ ধর্মবিশ্বাসের প্রতি আস্থাহীনতা ও দোলাচলতা এই অষ্টাদশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গঙ্গা ও ব্যাসের প্রসঙ্গে তার প্রমাণ মিলবে।

অন্নদামঙ্গল কাব্যে ব্যাসদেব চরিত্রের মানবায়ন :-

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের একটি অভিনব সৃষ্টি ব্যাস চরিত্র। ব্যাসদেবকে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভক্তি বীজের একজন ধর্ম প্রচারক আখ্যানেতা হিসাবে চিত্রিত করেছেন। চরিত্রটির মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে কলি যুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে বিস্তর তফাত, অপরিসীম মাতৃপ্রেম থাকলেও নিজের সংকীর্ণতা বশ করে তাকে উপহাসাস্পদ ও করুণা বলে প্রতিষ্ঠিত করে, ব্যাস দেব তার দৃষ্টান্ত।

বস্তুত ব্যাস দেবের মতো একটি পৌরাণিক চরিত্রকে যুগ প্রেক্ষিতে স্থাপন করে তাঁকে একই সঙ্গে যুগের সৃষ্টি এবং যুগন্ধীর করে তোলার অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ভারতচন্দ্র। আমরা জানি অষ্টাদশ শতাব্দী সংশয়ের যুগ হিসেবেই চিহ্নিত। দেবখণ্ডের শিব এবং অন্নদা চরিত্রে এই সংশয়ের চিহ্ন বর্তমান। তবে অবিশ্বাস ও দোলাচলতার পরিচয় সেখানে বিশেষ নাই। আসলে ব্যাসদেব চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে কাব্যে নানা প্রসঙ্গ এসেছে - সেগুলি যেমন যুগ সংগতি হয়ে উঠতে পেরেছে তেমনি তার মধ্য দিয়ে কবি অভিপ্রায়ও ব্যক্ত হয়েছে।

ভারতচন্দ্র নারায়ণ অংশ রূপে ব্যাসদেবকে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন - তাঁর পাণ্ডিত্য এবং পিতা মাতার পরিচয়ও দিয়েছেন, সুস্পষ্টভাবে অন্য ধর্মের প্রতি আকর্ষণ অনুভব না করার কারণটি এখানে উঠে এসেছে ভারতচন্দ্রে, ব্যাস দেবের মুখে বসিয়ে দিয়েছেন 'ধর্মের সার কথা', 'শিব পূজা নিষেধ' প্রসঙ্গটিতে ব্যাস দেবকে কেন্দ্র করে ভারতচন্দ্র তৎকালীন ধর্মীয় পরিবেশের চিত্র এঁকেছেন। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজনের জন্য ব্যাস দেবের মতো পণ্ডিত ব্যক্তি ও নায়কের রাজনৈতিক দলগুলির মতো নিজের স্বার্থে ধর্মীয় ব্যাখ্যাগুলিকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন।

ব্যাসদেবের চরিত্রের এই অ-নমনীয়তা তাঁর চরিত্রে অন্ত ক্ষোভ এনেছে, ভারতচন্দ্র বুঝিয়ে দিলেন সংকীর্ণচিত্ত ব্যক্তির বিদ্বেষী ব্যাস দাঁড়ালেন তার আত্মিক শক্তির সম্বল নিয়ে। শুধু তাই নয় দেব - স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে দেবতা যে তাঁকে পীড়ন করতে পারেন, নিষ্ঠুর বন্দী করে আবার অন্নহীন করে দিতে পারেন, ব্যাসের পরিণতি দেখিয়ে ভারতচন্দ্র দেব - চরিত্রের স্বার্থপরতাকে প্রত্যক্ষ রূপে অনাবৃত করে দিলেন।

তীর্থযাত্রী ব্যাসকে অন্ন দিয়ে তাঁর জীবন রক্ষা করেছেন অন্নদা। কিন্তু স্বার্থে (অবশ্য) নয় এখানে অন্নদা জানেন অন্ন দিয়ে তাঁর জীবন রক্ষা করেছেন অন্নদা। কিন্তু স্বার্থে অবশ্য নয় কারণ অন্নদা জানেন অভুক্ত থেকে ব্যাস দেবের কাছে কোনো কিছু পাওয়া সম্ভব - তাই তাঁকে নির্বাক থাকতে হবে। কিন্তু ব্যাসদেব, অন্নদার আশ্রয় ত্যাগ দিয়ে নিজেদের কাশীর সঙ্গে না ওঠার কথা। ভারতচন্দ্র এই ভাবে ব্যাস চরিত্রের মধ্যে দিয়ে মানব চরিত্রের প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

[খ] অন্নদামঙ্গল কাব্যে ঈশ্বরী পাটনি চরিত্রের মূল্যায়ন :-

ভারতচন্দ্রের এই পাটনীটি সকল শ্রেণীর অন্তরের মহিমা অর্জন করেছেন তার নিজের জীবনের প্রসন্নতার দৃষ্টি। ঈশ্বরী পাটনী নৌকা করে নদী পার হবার সময় অন্নপূর্ণা তাঁর পা দুখানি রেখেছিলেন নৌকার সেঁউতির পরে, দেবীর পাদ স্পর্শে নিমেষের মধ্যে কাঠের সেঁউতি হল সোনা। পাটনী তখন বিস্মিত হয়ে ভাবেন - এ তো মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়, তাই তরী থেকে উত্তরণ হয়ে নিচু নিল, তাঁকে অনুসরণ করতে দেখে দেবী অন্নদা নিজ পাটনিকে অনুসরণের কারণ, স্বামী তাঁকে সম্বোধন জানালেন, ইতিপূর্বে যা পরিচয় দিয়েছিলেন তা অর্ধেক লুকিয়ে নয়, এবং তিনি বলেছিলেন, তিনি কাশীর অন্নপূর্ণা। এবং ইচ্ছা মত বর প্রার্থনা করতে বললেন।

প্রণমিয়া পাটনী কহিছে জোড় হাতে,
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

এই সম্ভাষণের কথাবার্তার মধ্যে আমরা ঈশ্বরী পাটনীর চরিত্রের যে পরিচয় পাই, তাতে তার সহজ সরল গ্রাম্য হৃদয়ের অনুরাগে ভক্তি বিনম্র ভাবটি আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। পাটনি এই ভাবে সর্ব যুগ ধরে অনুকরণীয় নারী চরিত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ লোকোত্তীর্ণ সৃষ্টি হয়েছে তার কাব্যে। সুযোগ পেয়ে সুযোগের সদব্যবহার করেছে, কিন্তু সে নির্লোভী, দেবী যখন বর দিতে চেয়েছিলেন তখন সে চাইলেই অনেক মূল্যবান সম্পদ দাবী করতে পারত কিন্তু সে করে নি।

ঈশ্বরী পাটনীর আবির্ভাব সময়কাল ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, নবাবী অপশাসনে বাংলাদেশের বিপর্যস্ত এবং দেশে দীন প্রাণ বিপন্ন। চারিদিকে অরাজকতা তার উপর মারাঠা বীর ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে বাংলাদেশে বর্গী আক্রমণ ও লুণ্ঠন। ফলে বাঙালী সর্বহারা ও অন্নহারা, আশ্রয়হীনতা ও অন্নহীনতা তৎকালীন বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের রোজনামচা। সেই যুগের দেবতা অন্নদা মঙ্গলকাব্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেব-দেবতা যেন মানব চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে,

মানব চরিত্রের মধ্যে তার প্রতিফলন পাওয়া যায়, ঈশ্বরী পাটনী তৎকালীন নিঃস্ব মানুষের কাছে হৃদয়ের বাণী, যখন একমুঠো অন্নের জন্য যেমন দেবতা ও মানুষ প্রাণপাত পরিশ্রম করছে, তখনই সে চিরন্তন বাংলাদেশের মর্মমূলকে স্পর্শ করেছে। মানুষ এবং ঈশ্বরের একাত্মতা কথাই ফুটে উঠেছে ঈশ্বরী পাটনী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের শিব চরিত্রের মানবায়ন :-

অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রথম খণ্ডে বিস্তৃত পরিসরে শিবের অবস্থান। সতী ও উমা - দেবীর দুই জন্মেই শিব আছে, সুতরাং ভারতচন্দ্র অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের অনুসরণে শিবকে সতী পতি ও উমাপতি হিসেবেই অন্নদামঙ্গলে উপস্থিত আছেন, কাহিনি পুরাণ অনুসারে ব্রহ্মা - বিষ্ণু - মহেশ্বর ত্রিদেবের উপাসনায় রত ছিলেন। সতী দক্ষালয়ে যাবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা এবং নারাজ শিবকে অনুমতি দিতে বাধ্য, দশমহাবিদ্যারূপ প্রকাশ - এত পুরাণের অংশ। তবে পরবর্তী পর্যায়ে শিবকে লৌকিক সুরে নিয়ে আসবেন তার সূচনা ও এখানে হয়েছে, অন্যদিকে মানব চরিত্রের সঙ্গে মিলে গেলো এবং তাকে পিতৃগৃহে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিল। কবি এখানে সামাজিক বাস্তবতা ও পুরাণ কাহিনি শিবের দেবী মহিমার কেন্দ্রবিন্দু সরিয়েছে,

পুরাণে দক্ষযজ্ঞের স্থলে শিব নিন্দা শুনতে অসমর্থ সতী প্রাণত্যাগ করলেন, সহায়ক দক্ষযজ্ঞপণ্ড, দক্ষের মৃত্যু প্রসূতির প্রার্থনায় দক্ষের পুনরায় জীবন লাভ, সতীর অভিশাপে দক্ষের ছাগমুণ্ড হওয়া, প্রাণ ফিরে দক্ষের শিব বন্দনা, সতীর দেহ স্কন্ধে শিবের পৃথিবী ভ্রমণ ও বিষ্ণু কর্তৃক সতীর দেহকে ৫১টি খণ্ডে বিভক্ত। -

এবার তার দিকে তাকালেই ভারতচন্দ্র শিব কে ভিখারী রূপে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে, আমাদের মধ্যবিত্ত খাদ্য-দারিদ্র্য জীবনকেই প্রত্যক্ষ করে, অর্থাৎ, যুগের দাবি মেনেই শিব চরিত্রের এই অবনমন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল যুগের দর্পণে - এখানে তিনি অগ্রগামী।

লোকায়ত ও দেবী মহিমা - এই দুই বিপরীতের সংমিশ্রণে ভারতচন্দ্রের শিবচরিত্র গড়ে উঠেছে, তবে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে শিবের মানব ব্যক্তিত্ব অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, সমকালীনতার দাবি মেনেই শিবের মুখ দিয়ে হরি ও হরের অভেদত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অন্য দিকে বিচার করলে দেখা যাবে আধুনিক ভাবেই ভারতচন্দ্র শিবকে আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেছে।

☐ কাব্যগত দিক থেকে আধুনিকতা :-

⊛ ছন্দ-বৈচিত্র্য :-

ভারতচন্দ্র মধ্যযুগে বাংলা কাব্যে ছন্দের সম্ভার, পয়ার, মালঝাঁপ পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, একাবলী, ভুজঙ্গপ্রয়াত, দিগক্ষরা প্রভৃতি বিচিত্র ছন্দালংকার 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে শোনা যায়, যেমন - পয়ার ছন্দ, এই ছন্দে যতি স্থাপনের স্বাধীনতা প্রদর্শনে ভারতচন্দ্র মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের পূর্বাভাস দেখিয়ে গেছেন -

“কান্দে মেনকা রানী শিখরের কোলে লয়ে,
নাকে নথ বাজায়ে নারদমুনি হাসে,”

এমনি করেই কাব্যের, ছন্দ ভাবের বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করে কাব্যের স্বরবৈচিত্র্যের। এই সঙ্গতি ও বৈচিত্র্যের টানে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ছন্দকেও গ্রহণ করেছেন। বাংলা ছন্দের গতিপ্রাবাল্যের সঙ্গে অনেকাংশেই সঙ্গতি আছে এমন তূণক, ভুজঙ্গপ্রয়াত ইত্যাদি ছন্দের ব্যবহার করেছেন তিনি।

(★) **অলঙ্কার প্রয়োগ :** ছন্দের মতো অলঙ্কার প্রয়োগেও সুনিপুণ প্রয়োগেও কাব্যের সৌন্দর্য সৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের বাংলা কাব্যজগতের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। সংস্কৃত পণ্ডিত কবি ভারতচন্দ্র প্রায় সমস্ত অলংকারই তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছিলেন। যেমন - শব্দালংকার ও অর্থালংকার। তাঁর কাব্যে অনুপ্রাসের আশ্চর্য বৈচিত্র্য, ছেকানুপ্রাস এবং বহুক্ষেত্রে অন্ত্যানুপ্রাসের সৃষ্টি চমৎকারিত্ব। এবং ভারতচন্দ্র শুধু শ্রবণললিত অনুপ্রাসই রচনা করেননি, ধ্বনিতত্ত্বের মর্মজ্ঞ কর্ণস্বাধীনিয় অনুপ্রাসকেও তিনি স্বর্ণ মর্যাদা দিয়েছেন।

অনুপ্রাস যমকের অনেকটা সম্পর্ক আছে ছেকানুপ্রাসের সঙ্গে, আর সেই কারণেই ভারতচন্দ্র যমকের ব্যবহার করেছেন খুবই সংযতভাবে। "উগ্র জন বলে উগ্র কহিতে অপার", "দক্ষকৃতি সতী হৈলা সতী", ইত্যাদি বহু যমকের কয়েকটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ মাত্র।

(★) **প্রবচন :-** প্রকৃত ভারতচন্দ্রের কবিকৃতির এই অসামান্যত্ব কতোদূর তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের অজস্র সূক্তি-প্রবচনের সমষ্টিগুলি। প্রাত্যহিক জীবনে শব্দগুলিই নির্মল কারিগরির ছন্দে সমারোপিত হয়ে ও অলংকারে ভূষিত হয়ে এমন চরিত্রায়িত লাভ করেছে যে বিশেষ প্রসঙ্গের উক্তিতি বাগার্থসমৃদ্ধি প্রসঙ্গনিরপেক্ষ চিরকালের সূক্তিতে পরিণত হয়েছে।

'যে হোক সে হোক আরো করিব যতন,
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের আধুনিক জীবনভাবনা ও অভিনবত্ব

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের শুরু ভারতচন্দ্রের প্রয়াণে, গদ্যের প্রচলনে এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও ইংরেজের সংস্পর্শে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, মানবিকতাবোধ ও অতীতের পুনর্মূল্যায়ন প্রভৃতি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, কবি ভারতচন্দ্রের কাল যেহেতু মধ্যযুগের এবং তখনো বাংলা সাহিত্যে তথা সমাজ জীবনে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটেনি, তাই তাঁর কাব্যে আধুনিকতার সূত্র অনুসন্ধান করতে গেলে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। কেননা আধুনিক মন নিয়ে মধ্যযুগের কাব্যের আধুনিকতা অনুসন্ধান করলে অবশ্যই তা সঠিক নাও হতে পারে।

'আধুনিক' শব্দটি আপেক্ষিক, কারণ আজ যা আধুনিক, আগামী দিনে তা আধুনিক নাও হতে পারে। তবুও সমকালে আধুনিকতা ও প্রাচীনতা থাকতে পারে, তাই কখনো পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে ওঠে সৌন্দর্যের প্রতীক, আবার সেই চাঁদ কখনো ঝলসানো রুটি। ভারতচন্দ্রের জীবনবোধ এত প্রসারিত ছিল যে তিনি মধ্যযুগে বসেও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন। তার এই কারণে গতানুগতিক মঙ্গল কাব্যের ধারায় অভিনবত্ব সৃষ্টি করে তাঁর স্বীয় মৌলিক প্রতিভার পরিচয় রেখে যেতে পেরেছেন। তাঁর প্রতিভার মৌল বৈশিষ্ট্য হল দেবতাদের মানুষরূপে এঁকেছেন। নিম্নে বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরা হল →

① ভারতচন্দ্র দেবদেবীর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে তাঁদেরকে হাস্যরসের মাঝে কারিকেচার করেছেন।

② ছন্দের নানাভঙ্গির বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন কাব্যের বঙ্গরাজের মাধ্যমে। পুরাতন ভাবকে ছেড়ে নতুন ছন্দকে প্রকাশ করেছে।

③ অন্নদামঙ্গল কাব্যের ছন্দে ও কাব্যের সুরশ্লেষে আপেক্ষিকতার ক্ষেত্রে ভেদ রয়েছে।

④ মঙ্গল কাব্যকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা- সৃষ্টি উৎপত্তির কারণ, বন্দনা, দেবখণ্ড ও নরখণ্ড।

সিদ্ধান্ত

দীর্ঘ আলোচনার পর আমি দেখলাম যে মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে কেবলমাত্র লৌকিক ভাবনা নয় অবশ্য লৌকিক ভাবনা ও আধুনিক ভাবনার ও প্রভাব রয়েছে। মধ্যযুগের অন্যতম শাখা অনুবাদমঙ্গল থেকে শুরু করে ভাব কাহিনীর মধ্যে ও আমরা অনেক পৌরাণিক প্রভাব লক্ষ্য করতে পারি, যেমন - ঈশ্বরী পাটনী চরিত্র, শিবচরিত্র, ব্যাস কাহিনী প্রভৃতি উপাদানে সমৃদ্ধ। অতএব আমি বলতে পারি মধ্যযুগের সাহিত্যে লৌকিক ও পৌরাণিক প্রভাব যেমন দেখা যায় আধুনিকতার প্রভাব ও লক্ষ্যকরা যায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমরা এই প্রকল্পমূলক কাজটি সম্পন্ন করতে গিয়ে যে সব ব্যক্তি বা যে সমস্ত ব্যক্তির সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের সবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সমস্ত গ্রন্থাগারকে যে স্থান থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন গ্রন্থ ও নথিপত্র আমার প্রকল্প রচনায় কাজে সাহায্য করেছে। চুঁচুড়া ও স্বর্ণময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের তাঁদের পরামর্শ নির্দেশনা ও পরিচালনায় আমার এই অনুসন্ধান মূলক কাজটি সম্পন্ন হয়েছে।

EXAMINED

[illegible] [External]
3/9/23

শিক্ষক/ শিক্ষিকার স্বাক্ষর

রাখী কর

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya